আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শীতকালীন সংখ্যা

পৌষ – মাঘ ১৪২৯

শীতের বাতাস ধীরে ধারালো হতে শুরু করেছে। পুরনো একটা বছর শেষ হয়ে এল। স্টাইলিশ শীত পোশাকের আড়ালে একটু যেন অচেনাই মনে হচ্ছে না চেনা মানুষগুলোকে ? একদম, আর সেই চেনা অচেনার আবছায়াতে চলুন একটু বেরিয়ে পড়া যাক , বন্ধু বন্ধুনিদের হাত ধরে। 'বাংলা স্ট্রিট' –এর শুভেচ্ছা রইল এই শীতের মরশুমকে মনে রাখার মতো করে নিতে নিতেই ।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

বছর ঘুরে দেখতে দেখতে আবার শীত চলে এল। সামনেই বড়দিন।

শিরশিরে এই হাওয়ার দিনে আবার উৎসবের মুডে সবাই। পকেটে যতই টানাটানি থাকুক, টুকটাক এদিক ওদিকে একটু ঘুরে আসার ইচ্ছে সবারই। নেহাত পকেটে টান থাকলেই বা, হাল্কা শীতের রোদ গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোর মজাও কী কম ! এই মরশুমে বাংলা স্ট্রিট আবার আপনাদের সমীপে হাজির কিছু সাম্প্রতিক খবরের সঙ্গে চারপাশের নানা হাল-হদিশ নিয়ে। আসুন , জেনে নিই কেমন আছেন আমাদের নিকট প্রতিবেশীরা আর বাজারের হালচালই বা কেমন ...

সূচিপত্র

তীব্র অসাম্য, বদলে দিচ্ছে দেশের সমাজ, রাজনীতি Page 4
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড় Page 10
পার্থ রায়

ইরান : ক্ষোভের আগুনই নিয়ে এল জয় Page 13
শুভাশিস দে

ক্রিসমাস ক্যারল , কালো সায়েব-মেম আর এক টুকরো হারানো কলকাতা Page 15
কিঞ্জল রায়চৌধুরীর

কেকের রাজার দরবারে Page 20
মিতুল চৌধুরী

রাজপুরীতে... Page 23
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

কফিনের উৎসব- বিশ্বকাপ Page 26
অর্ণব বসু

লেখা ১

তীব্র অসাম্য, বদলে দিচ্ছে দেশের সমাজ ,রাজনীতি

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

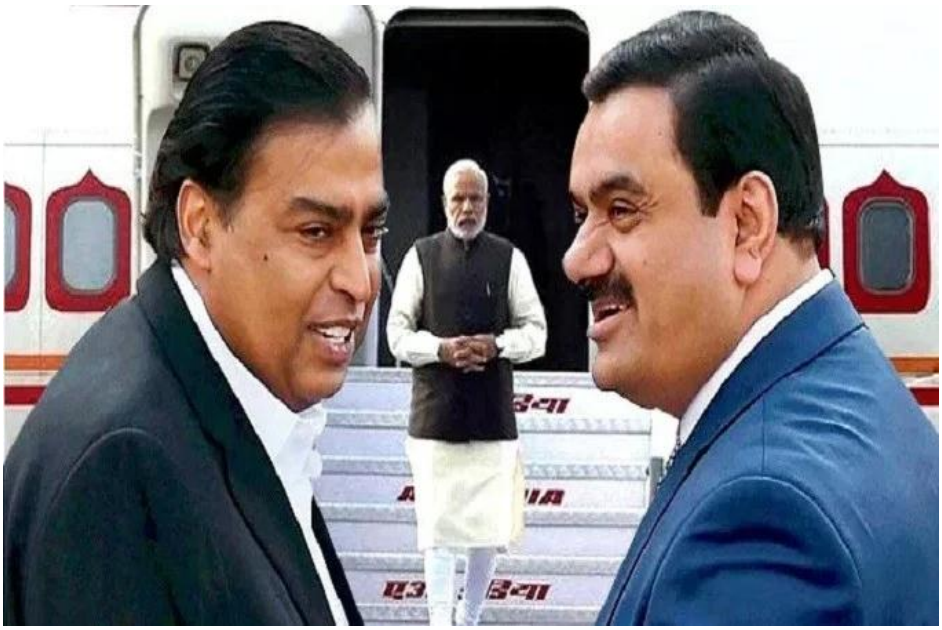

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশ দুটো টুকরো হতে বসেছে। এক, যাদের নিত্য ধন ও সম্পদ বাড়ছে, গুটি কয়েক ১ শতাংশ মানুষের একটি খণ্ড, অন্যটি বাকি দেশের কোটি কোটি মানুষ যাঁরা নিত্য দাম বৃদ্ধিতে কোণঠাসা হচ্ছেন । মোদী ঘনিষ্ঠ শুধু আম্বানি আদানির মতো পেটোয়া শিল্পপতিদের বৃদ্ধি শুধু নয়, সীমিত ওই এক শতাংশ অতি ধনী কুবের কুক্ষিগত করছে দেশের বৃহত্তর সম্পদ। তাদের মধ্যে থেকে একের পর এক শত কোটি টাকার সম্পদের মালিকের তালিকা বাড়ছে। আর তাদের পক্ষে রাজনীতির প্রক্রিয়া চালু বলে এমন এক অর্থনীতির কবলে রয়েছে দেশ যেখানে একইসঙ্গে বেকারের সংখ্যা, অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা অভুক্ত মানুষের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কিন্তু কেন? সরকার কি সাধারণ মানুষের ভালো থাকা চায় না? এর উত্তর খুঁজতে এদেশের অর্থনীতির অভিমুখ কোন দিকে সেটা দেখা দরকার।

দেশের সম্পদের ৭৬% এখন কুক্ষিগত এক শতাংশ মানুষের হাতে। ১৩০ কোটির মধ্যে এক শতাংশ মানে হচ্ছে এক কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ যারা ইউরোপের ধনী

ব্যক্তিদের সমকক্ষ বা টপকে যান অনায়াসে।তাঁরা প্রাসাদপম বাড়িতে থাকেন। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি গাড়ি ব্যবহার করেন। নিজস্ব জেটে বিদেশ দেশে পাড়ি দেন। এবং ইউরোপ এবং বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিনে বসে আছেন। ভারত সরকারের কাছে মাথা ব্যাথা এখন এই অতি বিত্তশালী এইচ এন আই রা,যাঁরা সরকারের নীতিতে ফুলে ফেঁপে এখন সরকারকেই কলা দেখাচ্ছেন অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে।

আসল সমস্যা অন্য জায়গায়। দেশের সম্পদ তাঁরা প্রতি নিয়ত কুক্ষিগত করেন সরকারের নীতির বদান্যতায় । তাই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাদের সম্পদ। কিন্তু সেই

সম্পদ সাধারণ মানুষের আয় বাড়াতে কাজে লাগছে না। করোনার পর থেকে অতি বিত্তবানদের লগ্নি ক্রমশ ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক সময় এদেরকেই ফুলিয়ে ফাপিয়ে তোলার জন্য ভারত সরকার তাদের নীতির উদারীকরণ করে জল জমি খনি জঙ্গল এদের হাতে তুলে দিয়েছিল। বর্তমান সরকার এসে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা অথবা তার কাঁচামাল সরবরাহ একে একে এদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বলা হচ্ছে সরকার এভাবে ব্যক্তিগত পুঁজিকে উৎসাহ দিবে তার মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থান বাড়বে। কিন্তু এর ফলে শিল্পপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটলেও চুঁয়ে পড়া নীতিতে সম্পদের থেকে আয় তৈরি যা হচ্ছে তার সিংহভাগ পাচ্ছে যে যত অর্থবান ততবেশি। আসলে অর্থনীতিতে অনেক সুযোগ তৈরি হলেও সেই সুযোগ থেকে আয় করতে হলে বেশি আরও বেশি পুঁজি খাটাতে হয়। তাই যার হাতে যত বেশি পুঁজি সেই ই আয় বাড়ানোর ওই সুযোগটা পাচ্ছে। ফলে এই উদারীকরণের সিংহভাগ সাফল্য শুষে নিয়েছে বিত্তবান এবং সম্পন্ন মধ্যবিত্ত। তার বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা রকম কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটানোর মধ্যে দিয়ে যে নিচু তলার থেকে মানুষকে ক্রমশেও উপরে উঠে আসতে সাহায্য করবে সেই প্রক্রিয়াটা খুবই ধীর। ক্রমশ তার ফলে সমাজের উপরের নিচের তলার মধ্যে অসাম্য ক্রমশ বাড়ছে।

করোনার পর সমস্ত দেশের অর্থনীতি যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে এদেশে গৌতম আদানিদের মতো নির্দিষ্ট কিছু শিল্পপতিদের আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েকশো গুণ বেশি । কিন্তু তারা দেশে লগ্নি করছেন তুলনামূলকভাবে যৎসামান্য। এদিকে কর্পোরেটমুখী উন্নয়ন করতে গিয়ে সরকার নিয়েছে হাত গুটিয়ে। ফলে কর্মসংস্থান নতুন করে তৈরি হচ্ছে না। বেসরকারি কর্পোরেট যে সামান্য লগ্নি এখনও পর্যন্ত

করেছে তাতে প্রয়োজনের অর্ধেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু সরকারি সম্পদের কুক্ষিগতকরণ চলছে। দেশে বড়লোক আরো বড়লোক হয়েছে । অন্যদিকে আয় বাড়ানোর কোন রাস্তা না তৈরি হওয়ায় গরিব আরো গরিব হচ্ছে। ফলে বাজার থেকে সাধারণ মানুষ সরে যাচ্ছেন। বাজারে শিল্প ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ক্রমশ কমছে। গুটিকয়েক পরিকাঠামো ক্ষেত্র, শিল্প,ভোগ্য পণ্য, গাড়ি, নির্মাণ আর তথ্য প্রযুক্তি শিল্প, পরিষেবা ক্ষেত্র সরকারের চোখের মনি। অর্থনীতির সুষম উন্নয়নে সরকারের কোনো লক্ষ্য নেই। কৃষি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প এবং অসংগঠিত ও সমবায় ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবিকা । তার অবস্থা খুবই খারাপ।এসব ক্ষেত্রে এমন অবস্থা যে সংসারে মাথা পিছু মাসে দুই হাজার টাকা আয় হয় না দেশের অর্ধেক পরিবারে । নামে তারা দরিদ্র সীমার উপরে, অথচ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বেঁচে আছে তীব্র অনটনে।

এদিকে সরকারের নীতিতেই তীব্র অসাম্যে বদলে যাচ্ছে অর্থনীতির ধাঁচ।চার চাকা আর ফ্ল্যাট কেনার লোকের সংখ্যা বাড়ছে , সরকারের নীতিতে তাদের জন্য ছাড়! কিন্তু চার টাকা বিস্কুটের দামের প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে কম। চাষের খরচ বাড়ছে সরকারের নীতিতেই। উপকরণের দাম বাড়ছে। সারের দাম বাড়ছে। কৃষি সংকুচিত করে প্রথমে ভাবা হত শিল্পের প্রসার ঘটলেই বোধ হয় উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান বেশি হবে।তাই দিনের পর দিন কৃষি মেরে শিল্পের আরাধনা করতে করতে সমাজে অসাম্য বেড়ে গেছে অনেকখানি। এখন আবার শিল্প নয়, ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চলছে সরকারের তরফে সারা দেশে নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে। সমস্ত গ্রামে ব্রড ব্যান্ড।চাষী খেতে পাক না পাক,ফ্রীতে ফেসবুক করবেই। ফলে নতুন উদ্যোগ আসছে নানা অ্যাপ তৈরির,সেগুলি নতুন অর্থনীতির ভাষায় স্টার্ট আপ। কারখানা বা ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প তৈরির বদলে সেসব এখন লক্ষ্য। গত দু বছরে এই দেশের একশটি স্টার্ট আপ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই সব স্টার্ট আপে কর্মী সংখ্যা মাত্র দুই থেকে বারো। আয় বাড়ছে উদ্যোগপতির, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ছে কই? এরপর সরকার চেষ্টা করল মুদ্রা স্কিম বা মেড ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে, তাতেও কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়লো না।এখন কর্পোরেট নেতৃত্বে উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে সরকার নিজের ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদ করছে ব্যাংক, রেলে সেনাবাহিনীর মতই চার বছরের।এতে তো অসাম্য আরো বাড়বে। অসাম্য যত বাড়বে দেশের বাজার থেকে কেনার ক্ষমতা থাকবে না বলেই একটা বড় অংশের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে । তাতে দেশের যে ভোগ্য শিল্প তাতে চাপ পড়বে।এভাবে অসাম্য বাড়লে বিপুল চাহিদা কমে আরো অনেক কর্মসংস্থান কমার আশঙ্কা তৈরি হবে।

এখন প্রশ্ন সরকার কাদের কথা ভাববে? চার চাকা , মোবাইল, ল্যাপটপ , ডিজিটাল গ্যাজেটস যাতে আরও বেশি বিক্রি হয় , বড় বড় শহরে যাতে আরো বেশি ফ্ল্যাট বিক্রি হয় একটি ভাবনা থেকে সরকার উন্নয়নের অগ্রাধিকার সাজাচ্ছে। এতে খাতায় কলমে দেশের যাবতীয় উন্নয়ন হচ্ছে নগর কেন্দ্রিক। এবং এই নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নকে ছড়িয়ে দিতে সরকার আরো ১০০ টি ছোট শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার কথা ভাবছে। তার জন্য দেশময় রাস্তা তৈরি করা, জাতীয় পরিকাঠামো তৈরি করা থেকে শুরু করে পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুতেই বেসরকারি লগ্নি আহবান করা, এবং জল, স্থল, মাটির নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র পরিকাঠামো নির্মাণের নামে নতুন হাজার হাজার কোটি টাকার লগ্নি হচ্ছে। সরকারের নিজের সংস্থার মাধ্যমে হলে ধনী দরিদ্র ব্যবধান কমত। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা হতো রাজকোষে। তার বদলে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভাবে আদানি এবং কয়েকটি কর্পোরেটের মাধ্যমে গত দুবছর সরকারের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পগুলোতে কাজ হচ্ছে। দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আমানত যা সাধারণ মানুষের বহু কষ্টে অর্জিত সঞ্চয় তৈরি হয়েছে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে এখন বড় বড় শিল্পপতিদের প্রকল্পে বিধিবদ্ধ পুঁজির মার্জিন না রেখেই।

বলা হচ্ছে সবই উন্নয়নের জন্য হচ্ছে। এসব করলে নাকি আগামী দিনে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং মানুষের কাছে জিনিসের দাম কমবে। কিন্তু ঘটছে তার ঠিক উল্টো।সরকারের এহেন পদক্ষেপ উত্তরোত্তর অসাম্য বাড়ছে। বেকারি বাড়ছে। কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। বিপুল সরকারি সম্পদ কালির খোঁচায় রাতারাতি বেসরকারি সম্পদে পরিণত হচ্ছে । তার জন্য তাদেরকে মেহনত করে কোম্পানি খুলে পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করতে হচ্ছে কম, মূলধন খাটিয়ে চাকরি সৃষ্টি করে তারপর সঞ্চয়কে সম্পদে পরিণত করতে হচ্ছে না। শুধু সরকারের নীতিতে আহবান করা হচ্ছে দরপত্র । আর সেই দরপত্র দেওয়ার খেলায় আজ আদানি ইন্ডাস্ট্রিজ দেশের সেরা শুধু না বিশ্বের সেরা ধনীদের অন্যতম। কিন্তু আদানি অধীনস্থ কোন কোম্পানিতে চিরাচরিত ব্যবসায়িক কাজের মাধ্যমে সেই পরিমাণ আয় বাড়াতে পারে নি ।যে পরিমাণ তার সম্পদ বেড়েছে ততটা তার কোম্পানির মুনাফার পরিমাণ বাড়ে নি।তাদের উদ্যোগে মুনাফার তুলনায় লগ্নি ও কর্মসংস্থানও বাড়ে নি।

এটা শুধুমাত্র আদানি ইন্ডাস্ট্রিজ এর খন্ড চিত্র নয়, রিলায়েন্স মাহিন্দ্রা থেকে শুরু করে সমস্ত বড় শিল্পগোষ্ঠীর ব্যালেন্স শিট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সম্পদের কুক্ষিগতকরণ অব্যাহত রয়েছে। তার একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন বড় শিল্পোন্নত

দেশে। এমনকি দেশের অতি বিত্তশালীরা ইউরোপের প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস শুরু করে দিচ্ছে শুধুমাত্র সে দেশে অর্থ লগ্নী করার ভিত্তিতে। তাদের বিদেশের কাজকর্মের উপর ভারত সরকার ট্যাক্স বসিয়ে রাজকোষ পূর্ণ করতেও পারছে না

তাহলে কেন এ দেশেই তাদের উপর অতিরিক্ত কর চাপানো হচ্ছে না? অতিবিত্তদের ব্যবসায়িক লেনদেন,মুনাফা এবং সম্পদ বৃদ্ধির ওপর অতিরিক্ত কর সারচার্জ বসানো হলে এ দেশে আগামী ১০ বছর সমস্ত গ্রামে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি করে স্কুল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে পারত। শুধু যে পরিমাণ অর্থ তাদেরকে লগ্নি করবার জন্য ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফেরত আসেনি সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে সারাদেশের সমস্ত গ্রামে রাস্তা তৈরি করে ফেলা যেতো। শুধুমাত্র সরকারি নীতির ইচ্ছাকৃত বদন্যতায় যেমন এদেশে একের পর এক কর্পোরেট শত শত কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছে ঠিক তেমনি প্রায় ৯৭ কোটি মানুষ দুবেলা ভালো করে পুষ্টিদায়ক খাবার খেতে পারছে না, জানাচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট। এই অসাম্য নতুন নয়। ১৯৯১ সালের দেশের অর্থনীতির উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে অসাম্য বাড়ছে। অসাম্য যত বাড়ছে ততই অপুষ্টি এবং বেকারি বাড়ছে।সাধারণ মানুষের হাতের টাকা কিছু সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে গেলে আর কী হয়? তার পরিণাম : খুব শিগগিরই আসছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কারের বিল। তাতে একদিকে বলা হচ্ছে সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কয়লা কিনতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে বেসরকারি সংস্থার কাছে বেশি দামে (ঘরে কম খরচের সরকারি কয়লা খনির কয়লা থাকলেও), ফলে এরপর বিদ্যুতের দাম বাড়বে। কয়লা সরবরাহ করে লাভ করবে বেসরকারি সংস্থা (ওরফে আদানি, রিলায়েন্স, টাটা, গোয়েনকা ইত্যাদি গোষ্ঠী)। আর তার দাম চুকাবে সাধারণ মানুষ। বিদ্যুতের দাম বাড়লে আরো বাড়বে জিনিসের দাম। তাতে যে বাজারে মানুষের চাহিদা কমে যাবে!

এখন খুচরো বাজারে চাহিদাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না সরকার। সরকারের মূল লক্ষ্য জি এস টি , ব্যক্তিগত কর আর বেসরকারি সংস্থার মুনাফার উপর ধার্য কর। তার থেকে যে আয় আসছে তাতেই রাজকোষ ভর্তি হয়ে যাবে। আর বর্ধিত মূল্য যাই হোক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানুষকে কিনতেই হবে। প্রতি কেনাকাটায় প্রতিবার জিএসটির থেকে যা আয় আসছে তাতে রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই ভালো আছে কর্পোরেট ভালো আছে সরকার, কৃষি ধুঁকলে, গ্রামে একশ দিনের কাজ ব্যাহত হলে, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের নাভিশ্বাস উঠলে, সাধারণ মানুষের পেটে টান পড়ে, ক্ষুদ্র ও

অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছোট ছোট উদ্যোগ তাতে বন্ধ হতে পারে, এমন আশঙ্কায় সরকার লক্ষ্য পূরণের স্বপ্ন দেখছে।কারণ সাধারণ মানুষের ছোট উদ্যোগ বন্ধ হচ্ছে যত বেশি, ততই বাজার চলে যাচ্ছে রিলায়েন্স জিও, আমাজন, ফ্লিপকর্টদের হাতে।এটাই চায় সরকার। তাহলে সরকারের জি এস টি বাড়ে। আম জনতার করে খাওয়ার জন্য ছোট দোকান, বা ছোট সংস্থার চাকরি বা ছোট উদ্যোগ কী দরকার!? সরকার পুষ্টি না দিক, খেতে দেবে রেশনে, বেকারি, কর্মসংস্থান নিয়ে আর কি ভাবা দরকার!!??

লেখা ২

একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়

পার্থ রায়

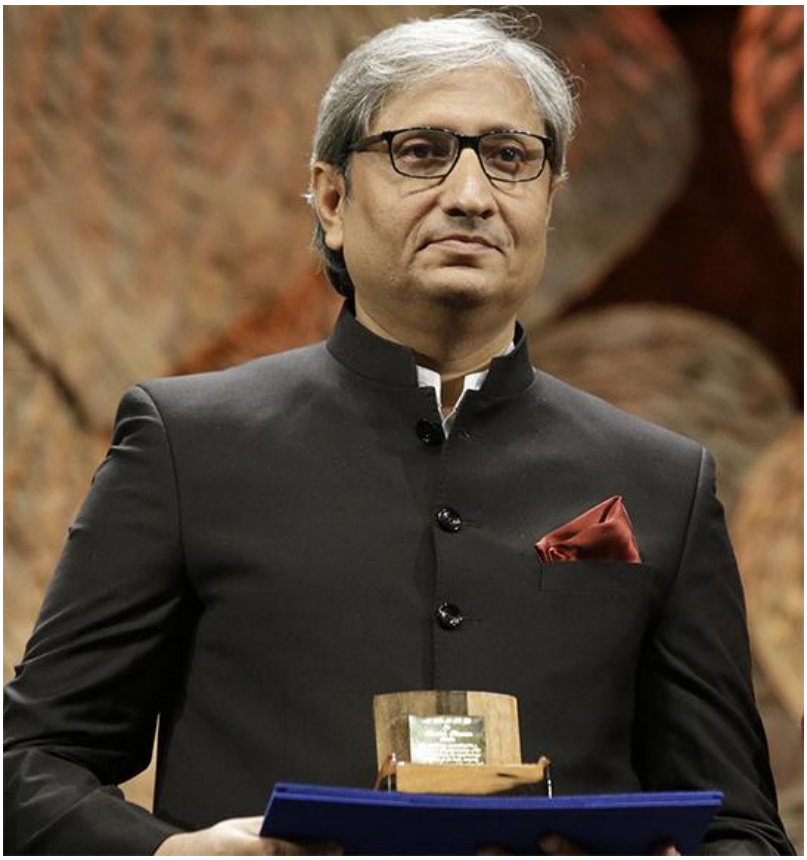

না। শেষ রক্ষা আর হল না। 'এনডিটিভি' নামক কেল্লাটির ফাঁপা মুলিবাঁশে যে বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুণ ধরেছে তা যাঁরা অল্প বিস্তর ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা ভালো করেই জানেন। 'এনডিটিভি'-র বোর্ড থেকে প্রণয় রায় এবং রাধিকা রায় ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের অপেক্ষাকৃত একমাত্র ভরসাস্থল অন্তিম স্তম্ভ এনডিটিভি-র পতন ঘটল। তার সঙ্গেসঙ্গে একজন সৎ, দৃঢ়চেতা মেরুদণ্ডের অধিকারী নির্ভীক সাংবাদিক রবীশ কুমারের ইস্তফা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

যাই হোক, স্বৈরাচারী শাসকের দীর্ঘ কামনা বাসনা আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি হল। রাষ্ট্রদ্রোহী মিডিয়া হাউজ এন ডি টিভি এখন ‘নরেন্দ্র দামোদর টিভি’ । অর্থাৎ যে 'গোদি মিডিয়া'-র সংখ্যা বৃদ্ধি হল তা বলাই বাহুল্য। নিন্দুকেরা অবশ্য রটিয়ে বেড়াচ্ছে একজন ছাপোষা পত্রকারকে জব্দ করতে নাকি 'পাহারাদার' গোটা মিডিয়া

হাউজই কিনে নিলেন। কত সহস্র কাঞ্চন মুদ্রায় এবং কী উপায়ে (সৎ/অসৎ) পৃথিবীর বর্তমান তৃতীয় ধনকুবেরের (ঋণ করিয়া ঘি খাওয়া ব্যক্তি) কাছে চ্যানেলটি হাতবদল হল তা নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট না করলেও চলবে। আমরা সকলেই জানি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং শেয়ার বাজারের নির্ণায়ক ব্যবস্থা 'সেবি' সবকিছুই 'গঙ্গা জল'-এর মতো পবিত্র আর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। আসল কথা হল সাংবাদিক রবিশ কুমার এনডিটিভি' থেকে ইস্তফা দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত গুজ্জু বেনিয়া এই নির্ভীক পত্রকারটির মেরুদন্ড ক্রয় করত অসমর্থ হল। ইতিহাসে এটাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বিদায় লগ্নের অন্তিম ভাষণ অনেক সময়ই আবেগঘন, যুক্তিহীন আর অসংলগ্ন হয়। তথাপি সাংবাদিক রবিশ কুমার আবেগকে দূরে সরিয়ে রেখে এই গণমাধ্যমটি সম্পর্কে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ভারতীয় উপমহাদেশে সেই অর্থে সংবাদ মাধ্যমের 'স্বর্ণ যুগ' (স্বাধীনতা) কখনোই ছিল না। কারণ আমরা ইন্দিরা জমানার কালো দিনগুলিকে (ডিক্লেয়ারড ইমার্জেন্সি টাইম) ভুলে যেতে পারি না। তবে তা ছিল ঘোষিত জরুরি অবস্থা। আজ যাকে রবিশ বাবু 'ভষ্ম যুগ' বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন তা-ও সত্যিই একপ্রকার অঘোষিত জরুরি অবস্থা যা পূর্বের চাইতেও ভয়ঙ্কর। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের জন্যে সমস্ত রকম কালো আইনগুলিকে আরও আঁটোসাটো আর জোরদার করা হয়েছে। সবচাইতে যেটা ভয়ঙ্কর তা হল, একদল পোষ্য বেনিয়া আজ টাকার থলি হাতে নিয়ে সেই আধুনিক মাধ্যমটির শিখরে অবস্থান করছে, যাদের কাজ সত্য সংবাদ পরিবেশনের বদলে শুধুমাত্র সরকারি স্তাবকতা ও গুণগান গাওয়া। গোয়েবলসীয় ঢঙে মিথ্যাকে বাস্তবের রূপ প্রদান করা। কেবল আশ্চর্য যে প্রকাশ্যেই তারা তা স্বীকার করতে এতটুকুও কুন্ঠা বোধ করছে না। আদানির বয়ানেই তার পূর্বাভাস মিলেছে।

যাই হোক, ঘটনা হল, পয়সার জোরে কিছু তৃতীয় শ্রেণির পেটোয়া সাংবাদিকদের 'জগৎ শেঠ'-রা কিনে নিয়েছে। চ্যানেলগুলিতে চলছে মাদারির খেলা। 'অ্যাঙ্কর' নামক নব্য একদল বাঁদর নেচে কুঁদে বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গিমায় সত্যের কন্ঠ রোধ করে সাজানো মিথ্যাকে তারস্বরে সত্য বলে প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। রবিশজি, আপনি ঠিকই বলেছেন, আশ্চর্য লাগে তখন যখন এরাই নীতি, নৈতিকতা, অধিকার, অভিব্যক্তি নামক শব্দগুলি উচ্চারণ করে। বাজারী হয়েও সতীত্বের দাবি করে। আপনি নিশ্চিত থাকুন রবিশবাবু, এইসব পত্রকারদের আমজনতা সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখছে

এবং চিরকাল দেখবে। বুঝি কষ্ট আপনার লাগছে যখন দেখতে পাচ্ছেন যুবা প্রজন্ম নিজস্ব গ্যাটের টাকা খরচ করে প্রবল উৎসাহে এই পেশায় আসার জন্যে উদগ্রীব আর আসার পর ধীরে ধীরে তাদেরকে জবরদস্তি ব্রোকার বা দালালে পরিণত করা হচ্ছে। কাজেই আত্মসম্মান বিসর্জন না দিতে চাওয়া অনিচ্ছুকরা ভয় ও লজ্জায় এই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

সবশেষে রবিশজি, আপনার ভাষাতেই বলি, সব লড়াই জেতার জন্যে নয়। সব লড়াইয়ে জিৎ নাও হতে পারে। কিন্তু কাপুরুষের মতো আপনি পিঠ দেখিয়ে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে চলে যাননি। আমরা জানি আপনি অকুতোভয় বীর বিদ্রোহী। আজ আপনি রণক্লান্ত, শ্রান্ত তবে শান্ত নন।

আশা রাখি ভবিষ্যতে ভারতবাসী আপনাকে নবরূপে দেখবে। আপনার আরও নতুন নতুন কর্মকান্ডের সঙ্গে পরিচিত হবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম, এই পেশায় যারা আসবে রবিশ কুমারকে মাইলফলক হিসেবেই তারা দেখবে।

একদিন ভোর হবেই। সত্য সন্ধানী দলের মুখিয়া হিসেবে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

লেখা ৩

ইরান : ক্ষোভের আগুনই নিয়ে এল জয়

শুভাশিস দে

হিজাব ঠিক মতো পরেননি বলে নীতি পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন বাইশ বছরের কুর্দিস তরুণী মাহসা আমিনের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহে আগুন জ্বলে উঠেছিল অতিরক্ষণশীল দেশ ইরানে। ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের পরেই এই দেশে নীতি পুলিশ জায়গা পেতে শুরু করে । তারা মেয়েদের পোশাকের উপর কড়া নজর রাখে, ১৯৮৩ সাল থেকে মেয়েদের প্রকাশ্যে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক হয় । ১৬ অক্টোবর নীতি পুলিশের হেফাজতে তরুণী মাহসা-র মৃত্যুর পর, রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হিজাব বিরোধী তরুণীদের গণ আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে । পুরুষদের একাংশ হিজাব বিরোধী আন্দোলনকে

সমর্থন করেন । কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী ইরানের দলও জাতীয় সঙ্গীতের সময় দেশের তীব্র আন্দোলনের সমর্থনে নীরব থাকে । বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের সমর্থনে আলোড়ন ওঠে । এতদিনে এদেশে তিনশোর বেশি বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবর । বেশিরভাগই তরুণী-তরুণ । মৃতদের মধ্যে কুড়িটির বেশি শিশুও রয়েছে বলে খবর । এছাড়াও ইরানের বহু মানুষকে নিগ্রহ করা হয়েছে । অবশেষে ডিসেম্বরের গোড়ায় এসে , আড়াই মাস পরে ইরানের ইব্রাহিম রইসি সরকার কিছুটা নরম অবস্থান নিতে বাধ্য হল বলেই খবর । এক ধর্মীয় সম্মেলনে ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ জাফর মন্টাজেরি জানান নীতি পুলিশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা । সরকার জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের তারা বিরোধিতা করবে না । আংশিক হলেও এ জয় অধিকার রক্ষার পক্ষে গণ আন্দোলনের জয় । এ জয় আংশিক হলেও প্রেরণামূলক দৃষ্টান্তস্বরূপ গণ আন্দোলনের জয় বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। নীতি পুলিশের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে, ইরানের ইসলামিক সরকারের বিরুদ্ধে এই আংশিক নৈতিক জয়ের কারিগর অতি রক্ষণশীল ইরান সমাজের অবস্থানের বিপরীতে গণ আন্দোলনরত তরুণী-তরুণ ও অংশগ্রহণকারী ইরানের মানুষদের এই জন্য সারা পৃথিবী থেকে সঙ্গে থাকার বার্তা দিয়েছেন সাধারণ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষেরা। তাঁদের একাংশের মতে, প্রথমত, মোরালিটি পুলিশ হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এর সঙ্গে হিজাব আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সমস্ত আইনই এখনো ইরানে বলবৎ রয়েছে বলেই তাঁরা মনে করছেন। মোরালিটি পুলিশ সরিয়ে দেওয়াটা আন্দোলন বন্ধ করার নতুন স্ট্র্যাটেজি বলেই তাঁদের ধারণা। যে জন্য সমস্ত কর্পোরেট কাগজ একে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছে, যার প্রথম সারিতে রয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস। ইরানের আন্দোলনকারীদের একটি বড় অংশও একে আইওয়াশ বলেই মনে করছেন। কারণ, ইরানি মহিলাদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য বহাল এই নীতি পুলিশ বাহিনী যে মন্ত্রকের অধীন সেই অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক যেহেতু এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি এখনো ফলে মন্টাজেরির মুখের কথাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাইছেন না তাঁরা। গত তিনমাস ধরে ইরানে খুন ধর্ষণ সহ অকথ্য অত্যাচার চলছে তাঁদের উপর। তাঁদের সরাসরি বক্তব্য, এই লড়াই চলবে। অনেক পথ বাকি। আন্দোলন আরো জোরদার হবে।

লেখা ৪

ক্রিসমাস ক্যারল , কালো সায়েব-মেম আর এক টুকরো হারানো কলকাতা

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

‘কালোসাহেবের মেয়ে ইস্কুল পালিয়ে ধরত তোমার দুটো হাত…’ অঞ্জন দত্তর এই গানটা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা ! কিন্তু সাহেব আবার কালো ? অর্থাৎ নেটিভ? তা কী করে হয় ! অবাক কাণ্ড হলেও সত্যি, এমনটাই হয়েছিল। একটি-দুটি নয় অনেকগুলি। সাহেব ভারতে এসে পড়লেন বাঙালি মেয়ের প্রেমে, বিয়ের পরে জন্ম হল যে ছেলেটির তিনিই তো কালো সাহেব ! আর তাঁর যদি মেয়ে হয়, সে-ও তো এখানে কোনো ছেলের প্রেমে পড়তেই পারে। আর এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলে এক সমান্তরাল ধারা – না-বিদেশি না-ইন্ডিয়ান, অথবা দুটোই… কলোনি গড়ে একদেশের মানচিত্রের মধ্যেই ভিন্ন আরেক মানচিত্র---সোয়াশো বছর ধরে এই কলকাতার রিপন স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, ক্রিক রো, বো ব্যারাকস।

ইতিহাস তো শুধু যুদ্ধ আর রক্তপাতই লেখে না।ভালোবাসা, অসমসম্পর্কের মিলন-বিচ্ছেদের কথাও লেখে।তাই বিশ্বযুদ্ধ ফুরিয়ে গেলে, সৈন্যরা ফিরে গেলেও থেকে যায়

বোব্যারাকস। এদেশকে নিজের দেশ ভেবেই রয়ে যান কিছু মানুষ, কেন-না ততদিনে যে এজমিতেই তাদের শিকড় ছড়িয়ে গেছে !

আজকের কলকাতায় রিপন স্ট্রিটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের খুঁজতে গেলে স্থানীয় গাইড ছাড়া গতি নেই। তবে একটু সময় আর আন্তরিকতা নিয়ে খুঁজলে জনৈক আব্বাস আপনাকে পৌঁছে দিতে পারেন জনৈক গোমসের ডেরায়, আপনি হিন্দু না হিন্দুস্থানি, বাঙাল না বাঙালি এসব জিজ্ঞেস না করেই, নির্দ্বিধায়।

কলকাতার পুরোনো মহল্লার একশো বছরের বৃদ্ধ বাড়ির সরু সিঁড়ির ফালি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে চারতলার কোনো এক দরজার ঘরে গিয়ে তালা ঝুলছে দেখলে বুঝতে হবে তিনি তাঁর মেয়ের বাড়িতে চলেগেছেন। কিন্তু বুড়ো ইসমাইল চাচা নিশ্চিত---গোমস ফিরবেই ! সামনে ক্রিস্টমাস যে ! কী , ধাঁধা লাগছে, তাই তো ? আরে মশাই, লাগবে না, লাগবে না। কেন লাগবে না ! প্রশ্ন করলেই উত্তর ছুটে আসবে, যে, এটাই হল গিয়ে সেই এক টুকরো আসল ভারতবর্ষ, যে ছবিটাকে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক স্বার্থলোভীরা বরাবর ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। করে এসেছে বরাবর। সফল যে হতে পারেনি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ রিপন স্ট্রিট, ক্রিকরো – এবং অবশ্য ---- অবশ্যই বোব্যারাকস।

কাজের সূত্রে রিপন স্ট্রিট বা ক্রিক রো-র অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিশে গেলেও, দু-চারঘরকে এখনো এভাবেই খুঁজে পেয়ে যাবেন, কথা দিচ্ছি , যাঁরা আসলে মজ্জায় আত্মায় টু হান্ড্রেড পারসেন্ট এই পাড়ারই লোক। তবে হ্যাঁ , কলকাতার বুকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন বোব্যারাকস কলোনির বাসিন্দারা। ‘কলকাতার শুধু নয়, ইন্ডিয়ার বুকে সর্ববৃহৎ এবং শেষ জীবিত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলোনি হল এই বোব্যারাকস’ । এভাবেই মাতৃভূমির

সুর ছুঁয়ে নিজের পাড়াকে আখ্যায়িত করলেন ‘বোব্যারাক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’ (BBRWA)-এর সেক্রেটারি মিসেস অ্যাঞ্জেলা গোভিন্দরাজ (Anj ela Govindraj)

কারা এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ? কোথা থেকে উদ্ভূত ? এ প্রশ্নের উত্তর জানলে আনন্দের সঙ্গে অপার বিস্ময় মিলে একাকার হয়ে যায়। যেমন ধরুন, এক দক্ষিণ ভারতীয় দম্পতি, যাঁদের মধ্যে স্ত্রীর জন্ম কলকাতায়, স্বামীর ব্যাঙ্গালোরে ; স্বামী-ভদ্রলোকের ঠাকুরদা খোদ ব্রিটিশ বটে, তবে কিনা জন্ম হয়েছিল ইরাকে ! আর দাদামশাই অর্থাৎ মায়ের বাবা ছিলেন পর্তুগিজ কিন্তু জন্মসূত্রে তামিল-ভূমির লোক, কেন-না তাঁরও বাবা ভারতে এসে বিয়ে করেছিলেন এক তামিলকন্যাকে ! কী আশ্চর্য ! ভাবতে পারছেন , কীভাবে এক সংস্কৃতির স্রোত এসে অপর সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে ! হ্যাঁ, এমনধারা শিকড়ের বিস্তার যাঁদের –তাঁদের বংশধররাই হলেন গিয়ে ‘অ্যাংলো ইন্ডিয়ান’ ।

মিসেস অ্যাঞ্জেলা এসে মেশেন মিস্টার গোভিন্দরাজের সঙ্গে , স্বাগত জানায় বোব্যারাকস — এক বৃহৎ পরিবার।

কলকাতার বুকে যদি একটুকরো লন্ডন দেখতে পান আর সেখানে গিয়ে মানুষগুলিকে যদি ভারতীয় বলে মনে হয় ! আশা করছেন ঝরঝরে বাংলা বলবে, কিন্তু শুনতে পেলেন ভাঙা-ভাঙা হিন্দি, তাতে স্পষ্টত বিদেশি উচ্চারণের টান ! নিশ্চিত ইনিই সেই অ্যাংলোইন্ডিয়ান। ‘না ঘরকা না ঘাটকা’ (!!)—ম্যাডাম অ্যাঞ্জেলার কথায় রাখঢাক নেই। পাশাপাশি বললেন, ‘বাট, হামলোগ হিঁয়া বহত খুশ হায়’ । চাঁদনি চক মেট্রো হয়ে যোগাযোগ ভবনের দিকে মুখ করে কিছুটা হেঁটেই বউবাজার থানার গা-ঘেঁষা গলিতে ঢুকে যান। ওখান থেকেই শুরু

হচ্ছে ‘বোস্ট্রিট’ বা ‘বোব্যারাকস’ । সারিসারি লাল ইটের বাড়িগুলোর কাছে গেলেই ভেসে আসবে ইংরেজি গান। সবুজ খড়খড়ির বড়োবড়ো জানলা আপনাকে অন্দরমহলে টানবেই। আর সেই টানেই আর বাইরে থাকতে না পেরে সটান ঢুকে পড়েছিলাম একটি বাড়ির ভিতরে। চুনকাম করা সাদা দেওয়াল আর কাঠের হাতলওয়ালা সিঁড়ির রেলিংয়ে লুকোনো ইতিহাস কানে-কানে ফিশফিশ করে উঠেছিল ! খোলা দরজার পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি বসার ঘর পেরিয়ে দেখতে পাই ভেতরের আলো-আঁধারিতে এক মহিলাকে, যিনি ঝরঝরে ইংরেজিতে ফোনালাপে ব্যস্ত। ওই অবস্থাতেই একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে যেভাবে স্বাগত জানালেন, এমন সৌজন্য সত্যিই বিরল ! বসার ঘরে যে ভদ্রলোক সবেমাত্র বাক্স খুলে একটি প্যাটিস মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন, আগন্তুককে দরজায় দেখে ভিতরে আসতে ইশারা করে যে-হাসিটি উপহার দিলেন তাতে সাগর-হাওয়ার ছোঁয়া লেগে আছে।এমন সারল্য ভরা হাসি জীবনে দেখিনি নিশ্চয় বলব না, তবে হ্যা এই কেজো দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করতে করতে অনেক-অনেকদিন যে চোখে পড়েনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই ! যিশুর ছবির নীচে ছোট্ট টেবিলে মোমবাতি আর মেটাল-ক্রশ, তার সামনে বাইবেলের খোলা-পাতা।

পরে জানলাম, প্যাটিস ভরা এই খাবারের বাক্সটি অন্য কোনো ফ্ল্যাট থেকে দিয়ে গেছে কেউ। আজ ম্যাডাম রান্না করেননি তাই দেখেই। এখানে সবাই সবার ঘরের খবরাখবর নেয়।এক পরিবারের অনুষ্ঠানে সব পরিবার মেতে ওঠে। এমনি করেই বছরের পর বছর কাটিয়ে যাচ্ছেন বোব্যারাকস-এর বাসিন্দারা।

তবে এর পেছনে অবশ্যই রয়ে গেছে দীর্ঘ সংগ্রামের লম্বা অধ্যায়। ব্রিটিশদের দ্বারা ওদেশে অস্বীকৃত, নিজগৃহে পরবাসী হয়েও লালবাড়িগুলোর ইট আঁকড়ে যারা রয়ে গেছিলেন তাদের কথা কমবেশি আলোচিত। একটা সময়ে দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ত, জলের লাইন ফেটে যেত, ইলেকট্রিসিটির বিভ্রাট।তবুও, তারা যাননি। থেকে গেছেন হাজার কষ্টের সামনে বুক পেতে দিয়ে। কলকাতার বুকে চাকরি মেলার একটা সহজ উপায় ছিল ইংরেজিজানা। স্রেফ এই জানাটাই ছিল জীবনধারণের সম্বল। আজ যদিও তাঁদের নাতিনাতনিরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। ডক্টর, নার্স, শিক্ষক --- বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন বৃত্তি। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। লালবাড়িগুলোকে নতুন করে মেরামত করানো হয়েছে সরকারি আনুকূল্যে, হেরিটেজ-রূপে গণ্য করা হয়েছে এই বৃহত্তম অ্যাংলোইন্ডিয়ান কলোনিকে। জানালেন

অ্যাঞ্জেলা গোভিন্দরাজ। কলকাতা তথা ভারতের অংশ হিসেবে এই স্বীকৃতিটুকুতেই আনন্দে চোখে জল আসে ম্যাডাম অ্যাঞ্জেলার।

লালবাড়িগুলোর ফ্ল্যাটেফ্ল্যাটে ১৪০টি পরিবার, সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে আরও ২৪টি, এঁদের নিয়েই বোব্যারাকস। পরস্পরের সুখেসুখী,দুঃখেদুঃখী এক সমান্তরাল পরিবারের ছবি। কাটছে দিন। সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের এক সুইপারের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে আর্থিক সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বাকি ১৫৫টি পরিবার। কখনও-বা কারওরসাথে ক্ষণিক ঝগড়া-বিবাদ, তার আধঘন্টা পরেই কেক অথবা গিফট নিয়ে মিটমাট করতে হাজির হচ্ছেনএকে অপরের দরজায়। এমন পরিবার সত্যিই আজ নজিরবিহীন।

একটু চেনাএকটু অচেনা, তবু এঁরাও আজ আমাদেরই লোক।

লেখা ৫

কেকের রাজার দরবারে

মিতুল চৌধুরী

ডিসেম্বর মাস মানেই উৎসবপ্রিয়, আমুদে আর স্বাদের আভিজাত্যে আস্থাবান বাঙালির মনে যা প্রথম বেল বাজায় তা হল মেরি ক্রিসমাস আর যিশু ঠাকুরের প্রিয় প্রসাদ ভ্যানিলা এসেন্সের সুগন্ধে ভরা ফ্রেশ বেকড প্লাম কেক। ক্রিসমাসের অন্তত ১০ দিন আগে থেকে পাড়ায় পাড়ায় দোকানে দোকানে যে দিকে চোখ পড়বে, আপনি এই কেকের সমারোহ দেখতে পাবেন তা বলাই বাহুল্য ।

তবে যদি বলেন এক্সেলেন্সের কথা, হেরিটেজের কথা, তবে আপনাকে স্মরণ করাব কলকাতার ঐতিহ্যকে আরেকটি বাড়তি মাত্রা যোগ করে যে নামটি , তা হল ' নাহুমস্'। তাদের নিজেদের দাবিতে শুধু কলকাতা বা ভারতবর্ষেই নয়, গোটা পৃথিবীতে কেকের কথা উঠলে তারাই সেরা।

১৯০২ সালে বাগদাদ থেকে কলকাতা আসেন ইসরাইল নাহুম। প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা শহরের প্রথম ইহুদি কেক শপ। তারপর গঙ্গা যমুনা কাবেরী গোদাবরী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল।স্বাদে গন্ধে দর্শনে সেকালের নাক উচু, সায়েবী কেতা দুরস্ত বাঙালির জিভকে , পলকে হয়ত নয়, তবু এক কথায় বললে তুড়ি দিয়েই যেন খানিকটা জয় করে নেয় তারা।ফলে সেই সেকালের নামী লোকজনের পাশাপাশি আজকের বাঙ্গালির
হারটথ্রব মান্না দে থেকে ঊষা উত্থুপ, সুচিত্রা সেন থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি, সকলের নাম পাবেন এই বেকারির গ্রাহকের তালিকায়।

কলকাতার সমস্ত সেলেব্রিটি থেকে গভর্নর হাউস অব্দি এই কেকের পৃষ্ঠপোষক। যদিও বর্তমান কর্ণধার আইজ্যাক নাহউম বার বার জোর দেন যে তারা পিপলস কেক শপ। অর্থাৎ কিনা সাধারণ জনগণের দোকান। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ও চাইনিজ , এই চার সম্প্রদায়ের মানুষই মূলত এই দোকানের আদি অন্ত গ্রাহক। দোকানের জনপ্রিয়তা ও ঐতিহ্য কর্তৃপক্ষ ধরে রেখেছেন তাদের গুণগত মান এবং ন্যায্য দামের জন্য। ক্রিসমাসের বিখ্যাত রিচ ফ্রুট কেক সমেত এদের মোটামুটি ৬০ টি আইটেম, ৮/- টাকা থেকে শুরু করে, ১০০০/- টাকা অব্দি এর রেঞ্জ । জনপ্রিয় আইটেম গুলো হল হার্ট কেক, চকোলেট রাম বল, হানি ফ্রুট প্লাম কেক, চিজ কেক, লেমোন টার্ট, এছাড়াও রয়েছে গার্লিক ব্রেড, সুইট বার্ন, কুকিজ এন' ব্রাউনিস্।

পুরনো হগ মার্কেটের ভেতর অলিগলি ও নানা দোকানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতেই আপনাকে নিজের সুগন্ধে আকৃষ্ট করে নেবে এই ১২০ বছরের ইহুদি ঐতিহ্য, সকাল সাড়ে নটা থেকে খোলা হলেও, কভিডের পর সময় পাল্টে সেটা হয়েছে সাড়ে

দশটা।তবে হ্যাঁ, সব আইটেম একসঙ্গে পেতে গেলে আপনাকে যেতে হবে বেলা ১২ টা থেকে ৪ টের মধ্যে। ১২/১৪ জন কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সামলাতে আজও হিমসিম খেতে হয়। আজও ২৫ বছরের পুরনো কর্মচারী এখানে বিদ্যমান। মিডিয়ার দৌলতে প্রচার প্রসার বেড়েছে অনেক, কিন্তু টিক উডের কাউন্টার সেকালের পুরোনো ফ্লোরিং, ছাত থেকে নেমে আসা দীর্ঘ সিলিং ফ্যান একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে দশকের পর দশক।

লেখা ৬

রাজপুরীতে...

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ভূতের বাড়ি হলেও-বা কথা ছিল। কিন্তু রাজবাড়িতে রাত কাটানো নিয়ে আমার মনের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। তবু পরিবার-পরিজনকে খুশি রাখতে, গেলাম ৩০০বছরের পুরনো বাওয়ালি রাজবাড়িতে। দোতলার গোটা বারান্দা জুড়েই, খানিকটা, নেমে এসেছে কাপড়ের কুচি,ঢেউ যেন। চোখে ভেসে উঠল ম্যাজিক রিয়ালিজমের মতো অজস্র বাস্তবতা। প্রবীণ জমিদার আরামকেদারায় বসে গড়গড়া টানছেন। পাশে গিন্নিমা পান সাজছেন। রুপোর ডিবাটি ঝলসে উঠছে আলোয়। পায়ের কাছে,অতি পুরাতন ভৃত্য।কেউ পোষা ময়নাকে খাঁচায় দানাপানি দিচ্ছে।কেউ আলতা পরছে।বাড়িময় লোকজনের হাঁটাহাঁটি।হাঁকাহাঁকি। চিকের আড়াল থেকে বৌ-ঝিদের নীচে উঁকিঝুঁকি। সব ভেসে ওঠে এক লহমায়।

কলেজে পড়তাম যখন, তখন উত্তর কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম, পুরনো বাড়ির খোঁজে। আজ দেখছি,এই প্রাচীন বাড়িটিকে অতীতের সুস্পষ্ট ছাপ ধরে রেখে,কী

সুন্দর, আধুনিক মোড়কে ঢেলে সাজানো হয়েছে! রাজবাড়ি বললেও আসলে এটা জমিদারবাড়ি। মণ্ডলদের জমিদারি আসলে এই বাওয়ালি। পদবী ছিল, রায়। বংশের পূর্বপুরুষ শোভারাম,এই মণ্ডল উপাধি পান। হিজলির রাজার থেকে উপহারস্বরুপ ৫০টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব পান শোভারামের পৌত্র রাজারাম। ১৭১০য়ের আশেপাশে তাঁরা বাওয়ালিতে বসবাস শুরু করেন। এঁরা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজারি। বাড়ির বহিরঙ্গের সৌন্দর্যকে একই রেখে বসতবাড়ি সংস্কার করে এই হেরিটেজ রিসর্ট গড়ে তোলা হয়।

রাজবাড়ি চত্বর প্রায় সাড়ে তিন একর জমির ওপর ছড়ানো। বাড়ির প্রায় ২৫টি ঘরে আছে থাকার ব্যবস্থা। কোনোটি ক্লাসিক হেরিটেজ। কোনোটি জমিদারি স্যুট তো কোনোটি রয়্যাল স্যুট। শুধু অন্দরমহলেই নয়, বাগান ও পুকুরসংলগ্ন এলাকাতেও আছে থাকার সুব্যবস্থা, নতুন বাড়ি, ছোটো বাড়ি,ডাক বাংলো তাদের মধ্যে অন্যতম। বাড়ির নানান অংশে ছড়িয়ে আছে রয়্যাল ডাইনিং রুম, সংগ্রহশালা, বৈঠকখানা,পিয়ানোরুম, লাইব্রেরি।একতলা হোক বা দোতলা, টানা বারান্দা জুড়ে রয়েছে পুরনো দিনের আসবাব। ভিন্টেজ টেলিফোন,গ্রামাফোন,যা পায়ে পায়ে পিছিয়ে নিয়ে যাবে সুদূর অতীতে। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়েই মন্দির।যদিও সেগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। কয়েকটিতে কাজও চলেছে। এই রাজবাড়ির অনতিদূরে এঁরা তৈরি করেছিলেন রাধাকান্ত জিউয়ের মন্দির। এখানে আজও দুর্গা পুজো হয়। সঙ্গে সঙ্গে, দীপাবলিতে হয় মহা সমারোহ। লক্ষ্মীপুজোও হয়ে থাকে। অতিথি-আপ্যায়ন চোখে পড়ার মতো আন্তরিক।যেমন আছে কাঁসার থালা বাটি খেলালে সাজানো গোছানো বাঙালি ভূরিভোজ, তেমনই পাশাপাশি বাহারি কন্টিনেন্টাল সব ডিশ। যখন সিংহদরজা পেরিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলাম,ঢাকের বাদ্যি, শাঁখের বাজনাসহ চন্দনের টিপ পরিয়ে বরণ করা হয়েছিল, তেমনই বিদায়বেলাতেও প্রদীপের উত্তাপ ছুঁইয়ে নারকেল নাড়ুর উষ্ণতা মুখে ভরে দেয়া হল।

এককথায় বলা চলে, মানসিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে গেছিলাম বটে, কিন্তু রাজবাড়িতে একরাত কাটিয়ে মুগ্ধ হয়ে ফিরলাম আমরা।

যাঁরা এখানে আসতে চান তাঁদের বলি,বজবজের বেশ কাছাকাছি এই বাওয়ালি রাজবাড়ি। নিজের গাড়ি কিংবা ভাড়া গাড়িতে আসা চলে যেমন,তেমনই কাছেই বজবজ স্টেশন,ট্রেন ধরে সেখানে নেমে অটো কিংবা বাসেও আসতে পারা যায়।

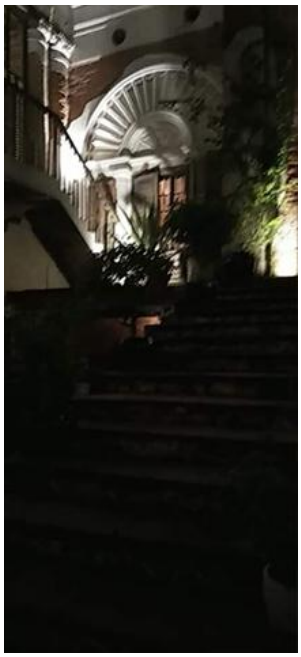

লেখা ৭

কফিনের উৎসব- বিশ্বকাপ

অর্ণব বসু

একটা দেশ। একটা দশ বছরের প্রোজেক্ট। ২০১১-২০২২। একটা গোটা দশক পেরিয়ে যায় ফুটবল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে। প্রস্তুতি চলাকালীন কেউ কেউ ঘরে ফেরেন, কেউ ফেরেন কফিনে। কারও কারও প্রিয়জন চলে যায় শুকনো পাতার মত উড়ে উড়ে, বহু দূরে, নতুন কোনো আস্তানায়, জীর্ণ শুকনো দেহে। মাটির নীচে, ঠান্ডায়, কফিনের ভেতর খুঁজলে এমন কয়েকশো মানুষের হাতে এখনও পাওয়া যাবে বালি, সিমেন্ট মাখানো আঙুল, ফুটে যাওয়া পেরেকের ক্ষত। ফুটবল- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলা। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু- তাও হয়ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উৎসব। ভারত থেকে কাতার, নানা রূপে, গত কয়েক দশক ধরে এই মৃত্যু মিছিল চলছেই। গ্রুপ লিগের লড়াই পেরিয়ে বিশ্বকাপ প্রায় শেষের দিকে। প্রিয় দল, প্রিয় প্লেয়ার এত কিছু প্রিয়-র মধ্যে থেকেও বার বার ভেসে আসে 'প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না'।

কাতারের বিশ্বকাপ এবার শুরু থেকেই খুব বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। হিউম্যান রাইটস, এলজিবিটিকিউ রাইটস এসব ছাড়াও নারীদের ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল শুরু থেকেই। আর সেই নিষেধাজ্ঞার মুখে চুন কালি দিয়ে প্রথম বারের জন্য বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্মানি বনাম কোস্টারিকার ম্যাচে রেফারি ছিলেন তিন মহিলা। ফ্রান্সের রেফারি স্টেফানি ফ্র্যাপার্ট ও তার সহকারী দুজন। কাতারের মত দেশে

যেখানে হাঁটুর ওপরের অংশ দেখানো প্রায় একধরণের ক্রাইম, সেখানে এই দৃশ্য কি তাদের জনগণেরও খানিকটা চোখ খুলে দেবে? নাকি কাতার থাকবে সেই আঁধারেই, এই বিশ্বকাপের আলো নিভে গেলেই ফিফা তার সর্বস্ব আধুনিকতা, সাম্যবাদ এসবের মোড়ক নিয়ে চলে যাবে নিজ নিজ স্থানে?

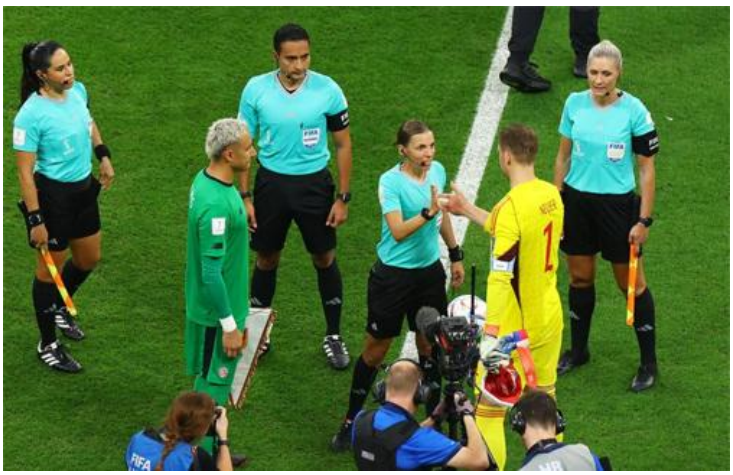

আজকাল যে কোনো কিছুই যে কেউ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে বয়কট করতে পারেন। বলিউডি সিনেমা থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল- সর্বত্র বয়কটের ডাক উঠছে বহুদিন ধরেই। স্যোশাল মিডিয়ায় দু লাইন লিখে বা হ্যাশট্যাগ দিলেই যে বয়কট হয়ে যায় না, তা যত তাড়াতাড়ি এই সমাজ বুঝবে, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। পেট্রোলিয়াম শেখদের থেকে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার ঘুষ নিয়ে যে একটা দেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করে ফেলা যায়, সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে দু-চারটে হ্যাশট্যাগে বয়কট করা একধরনের বোকামি ও সময়ের অপচয়। এই সিস্টেমকে বারবার প্রশ্ন করুন, আপনি মাঠে কিংবা বাড়িতে বসে টেলিভিশনে খেলা দেখুন, চাইলে আপনি বহু জায়গাতেই বহুরকম ভাবে প্রশ্ন করতে পারেন। ইরানের মেয়েরা যেভাবে লড়ে যাচ্ছে, সমস্ত বাধা নিষেধ পেরিয়ে, তারা এই মুহূর্তে প্রকৃষ্ট উদাহরণ

হতে পারেন। প্রতিবাদের জোর সবসময় বেশি। কিন্তু তা যেন এই বিশাল বড় ইভেন্টে, প্রিয় দল জেতার পাশাপাশি, তাদের গলায় মারা পরানোর পাশাপাশি কোথাও হারিয়ে না যায়। আফ্রিকার ও এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলো যেভাবে উঠে আসছে, আমাদের দেশ কিন্তু তার ধারে কাছ দিয়েও যায় না। এই আই এস এল বলে একটা সিস্টেম(লিগ বলা যায় কি?) যা ঘিরে রেখেছে চারপাশ, যার বয়স প্রায় নয় বছর হয়ে গেলো, তা আদৌ ভারতীয় ফুটবল, বাঙালির ফুটবলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছে তা আপনি ভারতের আন্তর্জাতিক খেলা দেখলেই বুঝতে পারবেন। উইকিপিডিয়ার ভার বাড়ানো আর ডার্বি ম্যাচের আবেগ ছাড়া আইএসএল এর ভূমিকা ভারতীয় ফুটবলে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে যা বাইরে, তা ঘরের ভেতরেও। আসলে বিশ্বকাপের কথা লিখতে হলে, একশো চল্লিশ কোটি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে

বারবার ভারতীয় ফুটবলের প্রসঙ্গ এসেই পড়ে। এসে পড়ে, তার ইতিহাস, ব্যর্থতা, গ্লানি ও প্রাপ্তি। কিন্তু প্রশ্ন চলতে থাকুক, খেলা দেখা ও তার আনন্দের মধ্যে দিয়েই।

ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো টুর্নামেন্ট শুরুর পূর্বে বিতর্ক সরিয়ে রেখে সমস্ত টিমকে ফুটবলে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমরা যারা দর্শক, আমরা কোথায় মনোযোগ দেব, তা নিশ্চয় ফিফা ঠিক করে দেবেন না? এই যে বড় টিমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক ওপেন সিক্রেট, কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, একের পর এক স্পন্সর থেকে কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের একচেটিয়া কারবার, এসবের দিকে মনোযোগ না দিলে একটা উৎসব দেখা কীভাবে সম্পন্ন হবে, বলুন।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন